একটি
কুকুরের
উপাখ্যান
তারাপদ রায়

একটি কুকুরের উপাখ্যান

তারাপদ রায়

প্রথম প্রকাশ

আনন্দমেলা ১৮ মে ১৯৮৩

ডিজিটালাইজড্

২০ জুন ২০২১

Sisir Suvro

কালু ও বুড়ো

রাস্তার দিকের তিন কোনাচে সিঁড়িটার উপরে দুটো কুকুর প্রায় সময় বসে থাকে। একটু কুকুর খুব বুড়ো, লোম পড়ে গেছে, ফোকলা দাঁত, চোখ দুটো কেমন ঘোলা-ঘোলা। হঠাৎ দেখলে ভয় হয়, পাগল নয় তো, কামড়াবে নাকি? কিন্তু বুড়ো কুকুরটা সে রকম স্বভাবের নয়, বয়েসের জন্যেই হোক অথবা শান্ত প্রকৃতির জন্যেই অনেক রাত্রে অচেনা লোক দেখলে ঘেউ-ঘেউ করা ছাড়া এমনি সে সবসময় চুপচাপ সিঁড়িটার উপরে শুয়ে থাকে। অনেকদিন ধরে আছে এ পাড়ায় কুকুরটা। কবে ছোটবেলায় জন্মেছিল, এ পাড়াতেই, এখন বুড়ো হয়েছে, আগে কী নাম ছিল, কেউ কখনো নাম দিয়েছিল কি না কে জানে, এখন পাড়ার কেউ-কেউ কুকুরটাকে বুড়ো বলে ডাকে।

দ্বিতীয় কুকুরটা কিন্তু তাজা আর জোয়ান। কালো কুচকুচে একটা খাঁটি দিশি। কুকুর। সারা দিনরাত রাস্তায় এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছুটে বেড়াচ্ছে। কখনো কাউকে তাড়া করে যাচ্ছে, কখনো ভিখারিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কখনো পুরনো কাগজ বিক্রিওলাদের কাঁধের কোলা ধরে টানছে; তবে শেষ পর্যন্ত কাউকে কামড়ায় না এই যা রক্ষা। গায়ের রঙের জন্যে এই কুকুরটার একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, পাড়ার সবাই একে কালু বলে ডাকে।

পরিতোষবাবু আগে খুব বেলা করে ঘুম থেকে উঠতেন। তিনি এই পাড়ায়, এই তিন কোনাচে সিঁড়িওলা একতলা বাড়িটায় মাসখানেক হল ভাড়া এসেছেন। এ পাড়ায় আসার পর থেকে খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, অন্ধকার থাকতে থাকতে। হয়তো নতুন বাড়ি বলে, হয়তো বয়েস বাড়ছে তারই লক্ষণ।

সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠা পরিতোষবাবুর ভালই লাগছে। কেমন আস্তে আস্তে রাস্তা ফসা হয়ে যাচ্ছে। দু-একটা কাক, দু-একটা পাখি কাছে দূরে ডেকে উঠছে। তিনি জানলার কাছে এসে দাঁড়ান। সকালের ইস্কুলের মেয়েরা এই

অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। পরিতোষবাবুর মেয়ে মালতী অবশ্য একটা দুপরের স্কুলে পড়ে।

পরিতোষবাবুদের সিঁড়ির উপরেই দুটোর আস্তানা। বুড়োটা প্রায় সব সময়েই থাকে, আর কালু মাঝেমধ্যে ঘুমানোর জন্যে আসে। যখন কেউ নামা-ওঠা করে সিঁড়িটা দিয়ে দুটো কুকুই একটু সরে বা গুটিয়ে গিয়ে যাতায়াতের পথ করে দেয়।

পরিতোষবাবুদের কোনো অসুবিধে হয় না , স্ত্রী-কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। পরিতোষবাবুর স্ত্রী যে কুকুর খুব পছন্দ করেন তা নয়, কিন্তু পরিতোষবাবু নিজে কুকুর ভালবাসেন আর তাঁর মেয়ে মালতী কুকুর বলতে পাগল হয়ে যায়। যেকোনো বাড়িতে, এমনকী রাস্তায় কোনো নোংরা কুকুর দেখলেও মালতী তাকে আদর করতে যায়।

সকালবেলা জানালায় দাঁড়িয়ে পরিতোষবাবু বুড়ো কুকুর আর ভ্যানওলার আলাপের দৃশ্যটা প্রতিদিন দেবেন। তারপর পাউরুটিওলা ক্রিং ক্রিং করে বেল দিয়ে চলে যায়। বুড়ো আস্তে আস্তে সিঁড়ির উপরে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এই সময় কালু অনেক দূরে গলির মোড় পর্যন্ত চলে যায়। বুড়ো সিঁড়িতে একা-একা। পরিতোষবাবুর স্ত্রী কন্যা তখনো ঘুমিয়ে, পরিতোষবাবু সন্তর্পণে রান্নাঘরে গিয়ে সকালের বরাদ্দ থিন এরারুট বিস্কুটের থেকে একটা বিস্কুট এনে বুড়োকে দেন, কোনোদিন যদি কালু এসে যায় কালুকেও একটা দেন। কালু দ্রুতগতিতে লেজ নাড়ে, বুড়ো হোঁয়ো-হোঁয়ো করে কৃতজ্ঞতা জানায়।

একেকদিন মালতীর মা রাগারগি করেন, দিন শুরু হওয়ার আগেই দুটো বিকট

অপব্যয়, এ ভাবে চলবে কী করে?

কিন্তু এর মধ্যে একদিন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। পাড়ায়-পাড়ায় রাস্তার কুকুরের উৎপাত নাকি খুব বেড়ে গেছে। লোকজনকে কামড়ে দিচ্ছে, তাদের কঠিন ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে। অনেক সময় লোক মারাও যাচ্ছে কুকুরের

কামড়ের বিষে । লোকে এই সব নিয়ে চিঠিপত্র লিখছে খবরের কাগজে, ফোন করছে থানায়, কর্পোরেশনের অফিসে।

আজ কয়েকদিন হল কর্পোরেশন থেকে রাস্তার কুকুর ধরার অভিযান শুরু হয়েছে, খবরটা কাগজে দেখেছিলেন পরিতোষবাবু। আজ সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর বাড়ির কাছেই একটা ছোট জটলা, আর তাঁর বাড়ির জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে মালতী চোখ মুছছে।

চিন্তিত হলেন পরিতোষবাবু, কী হল? বাড়ির কাছে এগিয়ে শুনলেন একটু আগে কর্পোরেশনের গাড়ি এসে কালুকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছে। পরিতোষবাবু তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকলেন। মালতী পরিতোষবাবুকে জাপটে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

কালুকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে চলে গেছে কর্পোরেশনের জালে ঢাকা গাড়ি। রাস্তায় পাড়ার দু-একজন লোক অবশ্য আপত্তি করেছিল, তাতে কর্পোরেশনের। লোকেরা কর্ণপাত করেনি, বরং বলেছে, আপনারাই আমাদের নামে নালিশ করেন রাস্তার কুকুর ধরি না বলে, আবার আপনারাই ধরতে এলে বাধা দেন।

কালুকে নিয়ে গেছে, কিন্তু বুড়ো সিঁড়ির উপরে শুয়ে ছিল, তাকে বোধহয় বাড়ির কুকুর ভেবেছে, কিংবা হয়তো দেখতে পায়নি। তাই বুড়ো রক্ষা পেয়েছে।

মালতী কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, “বাবা, কালুকে নিয়ে গিয়ে ওরা কী করবে? কুকুর ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা কী করে?”

পরিতোষবাবু যে ব্যাপারটা ভাল জানেন, তা নয়। তবু তাঁর একটা অনুমান আছে। তিনি মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনামনস্কভাবে বললেন, “বোধহয় মেরে ফেলে।” শোনামাত্র মালতী আরো ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। যেমন হয়, সেদিন সন্ধ্যায় আরো কিছুটা কান্নাকাটি করে ক্লান্ত হয়ে মালতী একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ইস্কুলে যাওয়ার সময় শূন্য রাস্তায় কালুর কথা মনে পড়ে তার চোখে একবার জল এল। কয়েকদিনের মধ্যে মালতী-সুদ্ধ প্রায় সকলেই কালুর কথা ভুলে গেল।

বুড়োর খাবারের ভাগ এখন আর একটু বেড়েছে। কিন্তু তার আর খুব খাবারের আগ্রহ নেই। সারা দিন রাতই প্রায় ঝিমোয়। একদিন সকালবেলা পরিতোষবাবু লক্ষ করলেন বুড়োর বন্ধু সেই রুটিওলা এসে ক্রিং ক্রিং করার পরেও বুড়ো এল না। পরিতোষবাবু সিঁড়ির দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে দেখলেন বুড়ো কুকুরটা নিস্পন্দ পড়ে আছে। রুটিওলাও কী ভেবে সিঁড়িটার কাছে বুড়োকে খুঁজতে এসেছিল, সামনে এসে একবার বুড়োর দিকে তাকিয়ে পরিতোষবাবুকে বলল, "মরে গেল। খুব তেজি ছিল কুকুরটা জোয়ান বয়েসে। এই তো সেদিনের কথা।" বলে লোকটা মলিন হেসে সাইকেল-ভ্যানটা চালিয়ে চলে গেল।

কুকুরছানা আসবে

বুড়োর মৃত্যুতে মালতী আরো মনমরা হয়ে গেল। সকালবেলায় ভাল করে টের পায়নি কিন্তু ইস্কুল থেকে ফিরে এসে খাবার দিতে গিয়ে যখন ডেকে ডেকে বুড়োকে পেল না তখন থেকেই তার মন খারাপ।

এ-সব বাপারে মার সঙ্গে কোনো কথা মালতী বলে না। বিকেলে বাবা অফিস থেকে ফিরে আসতে তাঁকে বলতেই পরিতোষবাবু সকালবেলার কথা মালতীকে বললেন, “বুড়ো হয়েছিল, কষ্ট পাচ্ছিল, ভালই হয়েছে।” চোখভরা জল নিয়ে মালতী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, “আমরা একটা কুকুর পুষব। রাস্তার কুকুর নয়, আমাদের ঘরেই থাকবে।”

পরিতোষবাবু বললেন, “এই ছোট তিনটে ঘরে আমাদেরই অসুবিধে হয়, কুকুর থাকবে কোথায়? আর তা ছাড়া কুকুর-পোষা খুব ঝামেলা, তার অসুখ-বিসুখ আছে, পেচ্ছাপ-পায়খানা আছে।”

মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, “সে তুমি ভেবো না। সব আমি করব । আমার বন্ধু চম্পার কুকুর আছে, সে নিজে দুবেলা কুকুরকে মাঠে নিয়ে যায়। তারপর। যেন কুকুর নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে এই রকম ধরে নিয়ে মালতী বলল, “আমরা কিন্তু ঘুঙুর-লাগানো বকলস কিনব, যেখানেই যাবে, টুং-টুং করে শব্দ হবে।” পরিতোষবাবু মালতীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “দ্যাখো, তোমার মা রাজি কি না?” মালতী এতক্ষণ এ-দিকটা ভাবেনি, সে খুব চিন্তিত মুখে বলল, “বাবা, মা কিন্তু রাজি হবে না।”

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মালতীর মা, মনোরমা দেবী বাসায় একটা কুকুর পোষার বিষয়ে খুব কিছু আপত্তি করলেন না। বরং তিনি বললেন, “চারদিকে যা চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। দুপুরের দিকে পুরো পাড়াটা নিঝুম হয়ে যায়, তোমরাও বাসায় থাকো না। আগে তবু কুকুরদুটো সিঁড়ির উপরে থাকত, বেশ কিছুটা ভরসা পেতাম।”

তারপর একটু চিন্তা করে মনোরমা বললেন, "কুকুরছানা পাবে কোথায়? খুব বড় জাতের কুকুর হলে এ-টুকু বাড়িতে কষ্ট হবে। খুব ছোট কুকুর, খেলনা কুকুরও কাজে লাগবে না।"

মনোরমার কুকুর আনতে আপত্তি নেই। দেখে মালতী ও পরিতোষবাবু দুজনেই খুব খুশি। পরিতোষবাবু বললেন, "আমাদের চেনাশোনা অনেকের কুকুর আছে। কিন্তু তাদের কাছে কুকুরছানা চাইতে আমার। লজ্জা করবে। তবে, তাদের কেউ-কেউ কুকুরছানা বেচে শুনেছি, তবে আমার কাছে। হয়তো বেচতে চাইবে না, আবার এমনিও দেব না।"

মনোরমা দেবী বললেন, "কেন, ইংরেজি খবরের কাগজে কুকুরের বাচ্চা বিক্রির বিজ্ঞাপন বের হয়। সেই বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজ করলেই হবে।"

পরিতোষবাবু তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললেন, "আরে না না, সে সব ডাকাতের দাম। আমি প্রথমে নিউ মার্কেটে দেখব, সেখানে যদি ঠিকমতো না পাই রবিবার সকালে যাব হাতিবাগান বাজারের সামনে, সেখানে নাকি ভাল কুকুরছানা কম দামে পাওয়া যায়।"

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, এই রবিবার নয়, মাসের শেষ। হাতে টাকা নেই, সামনের ছয়ই ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম রবিবারে পরিতোষবাবু মালতীকে নিয়ে কুকুর কিনতে বেরোবেন। একশো টাকার মধ্যে যদি হয় একটা কুকুরছানা নিয়ে আসবেন। মারি জাতের একটা কুকুর, খুব ভাল জাতের না হলেও চলবে।

কুকুরছানা এসে গেল

নিউ মার্কেটে এসে রীতিমত জব্দ হয়ে গেলেন পরিতোষবাবু।

এদিকে তাঁর বিশেষ আসা হয় না। শেষবার এসেছিলেন প্রায় কুড়ি বছর আগে কলেজে পড়ার সময় তাঁর এক বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে কাকাতুয়া কিনতে।

হগ সাহেবের আসল বাজারটার দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে ঢুকে বাঁয়ের গলিতেই ছিল পশু-পাখির বাজারটা। সেবার যখন এসেছিলেন কত রকম প্রাণী

দেখেছিলেন। শেয়ালছানা, কুকুরছানা থেকে একটা ছোট ভাল্লুক পর্যন্ত, এমনকী একটা ময়াল সাপ। আর কত রকম যে পাখি, টিয়া-ময়না রাজহাঁস এমনকী শালিক-চড়ুই, যত রকম ভাবা যায়, তা ছাড়া হাঁস-মুর্গি তো আছেই।

দুঃখের বিষয় পুরনো জায়গায় পৌঁছে পরিতোষবাবু আবিষ্কার করলেন সেই পশুপাখির বাড়িটা ভেঙে ফেলেছে, পুরো জায়গাটা এখন টিন দিয়ে ঘেরা। সামনের আলু-পেঁয়াজের বাজারের এক বুড়ো দোকানদার বললেন, "এখানে দশতল নতুন বাজার উঠবে। আস্তে আস্তে পুরো বাজারটাই ভেঙে নতুন করে দশতলা বাজার তৈরি হবে।"

পরিতোষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে পশুপাখির বাজারটা উঠে গেল।" আলুওলা বললেন, "না, ঠিক উঠে যায়নি। সরে গেছে ওদিকটায় পশ্চিমপার্শ্বে। তবে এখন আর তেমন রমরমা নেই।"

বাজারের হাল দেখে পরিতোষবাবু যতটা নিরাশ হলেন, ততোধিক দমে গেল মালতী। তাড়াতাড়ি দুজনে বাজার থেকে। বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে এসে ট্রাম ডিপো। থেকে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠলেন। এতক্ষণ চুপ করে ছিল মালতী, ট্রামে উঠে মালতী প্রশ্ন করল, "বাবা, এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?" পরিতোষবাবু মৃদু জবাব দিলেন, "হাতিবাগান বাজারে।" মালতী আবার প্রশ্ন করল, "হাতিবাগান বাজারে কুকুরছানা পাওয়া যাবে তো?" পরিতোষবাবু বললেন, "চলল, গিয়ে দেখি।"

হাতিবাগান বাজারে কিন্তু কুকুরছানা পাওয়া গেল। বেশ কয়েকটাই রয়েছে। দেখতেও খুব সুন্দর। বিশেষ করে কয়েকটা স্প্যানিয়েল আর পমেরানিয়ানের ছানা খুবই চমৎকার দেখতে। আর তাছাড়া একজনের কাছে ছিল একটা আলসেশিয়ানের বাচ্চা, সেটা একটু বড়-সড় এবং খুবই চঞ্চল। বাজারের সামনে অত লোকজন দেখে সে অস্থির হয়ে পড়েছে।

এই কুকুরছানাদের মালিকেরা তাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাম যা হাঁকছে সেটা অবিশ্বাস্য। প্রথমেই পরিতোষবাবু অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চাটার দাম জিজ্ঞাসা করলেন, শুধু দাম জানার জন্যেই জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ এত বড় জাতের

কুকুর তিনি কিনবেন না। কেনার ক্ষমতাও তাঁর নেই। আলসেশিয়ানওলা কুকুরছানার দাম বলল, “দেড় হাজার টাকা।” পরিতোষবাবু শুনে রীতিমত চমকে গেলেন।

ছোটখাটো স্প্যানিয়েল বা পমেরানিয়ান শাবকের দামও কিছু কম নয়, কারও দাম সাতশো, কারোর সাড়ে-সাতশো।

হঠাৎ পাশের থেকে পথচারী এক অচেনা ভদ্রলোক, যিনি অনেকক্ষণ ধরে এই কুকুরছানার কেনাবেচা দেখছিলেন তিনি পরিতোষবাবুকে বললেন, “শস্তায় কুকুরছানা চান তো গঙ্গার ধারে ফোটের কাছে যান। সেখানে এখনো বেদেরা। আছে। তাদের কাছে নানা দামের নানা জাতের কুকুর আছে, শস্তায় পেয়ে যাবেন।” এই শুনে একজন কুকুরওলা। বিরক্ত হয়ে বললেন, “সে সব রদ্দি জংলি কুকুর। সেগুলো মোটেই ভাল জাতের নয়।”

কিন্তু পরিতোষবাবু অচেনা ভদ্রলোকের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তিনি আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে পড়ল নারকেল দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অনেক কুকুরছানা অনেক সময় দেখেছেন, গঙ্গার ধারে লোকজনদের সেই কুকুরছানা দামদর করতেও দেখেছেন। নিশ্চয়ই শস্তা হবে সেখানে।

আবার ট্রাম। ট্রামে করে আবার এসপ্ল্যানেড। বেলা প্রায় বারোটা বাজে এখন, যদিও মাঘমাস এখনো শেষ হয়নি, এই ভরদুপুরে চারদিক রীতিমত গরম। সকালে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছিল, বাপ-মেয়ে দুজনেই সোয়েটার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে ছিলেন। এখন ঘামছেন।

এ ছাড়া এসপ্লানেড থেকে গঙ্গার ধার, সেও অনেকটা রাস্তা, বাস-ট্রাম বিশেষ নেই। প্রায় পনেরো মিনিট হাঁটতে হয়।

ঠিক আছে, তাই সই। পরিতোষবাবু আর মালতী রোদ্দুর আর খিদে উপেক্ষা করে গঙ্গার দিকে জোর পা চালালেন।

প্রায় প্রত্যেক বছর কলকাতার এই গঙ্গার পারে শীতের সময় বেদেরা এসে আস্তানা বাঁধে। বেশি দিন থাকে না, গরম পড়তে না পড়তেই আবার বেরিয়ে

পড়ে। এ বছরও প্রায় সবাই চলে গেছে। ফোর্টের সামনের মাঠে আর গঙ্গার পাশে রেললাইনের ধার ধরে এখন আর মাত্র দু-চারটে বেদে পরিবার। তাঁবু ফেলে রয়েছে, হয়তো তারাও দু-চারদিনের মধ্যে চলে যাবে।

প্রায় প্রত্যেক বেদে-পরিবারের সঙ্গেই কুকুর রয়েছে। অ্যালসেশিয়ানের মতো বড় হলেও দিশি কুকুরের চেয়ে এ কুকুরগুলো বড় জাতের। কেউ বলে পাহাড়ি কুকুর, কেউ বলে বুনো জংলি কুকুর। বোধহয় পাহাড়ি কুকুরই হবে।

পরিতোষবাবু এবং মালতীকে ঘুরে ঘুরে কুকুর দেখতে দেখে, এক বুড়ো বেদে গাছের নীচে ছায়ায় শুয়ে বিড়ি খাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করল, “বাবু, কুকুর কিনতে এসেছেন?

পরিতোষবাবু বললেন, “কিনতে তো এসেছি কিন্তু কুকুরছানা কোথায়? এ যা দেখছি সবই তো বড় কুকুর।।

বুড়ো উঠে বসল, “বাবু আগে এলেন না। সব বিক্রি হয়ে গেল, সবাই চলেও গেল। শুধু বেমারি হয়েছে বলে আমরা তিন ঘর যেতে পারিনি। তবে মাত্র দুটো কুকুরছানা আমার কাছে আছে, আমি নিজের জন্যে রেখেছিলাম, আপনি যদি চান দিতে পারি।”

পরিতোষবাবু বুঝলেন, এ সমস্ত দাম বাড়ানোর বুদ্ধি। তিনি বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললেন, তা হলে থাক।”

বুড়োটা কিন্তু উঠে গিয়ে একটু দূরে এক বড় গাছের কাছে গেল। সেখানে গিয়ে পরিতোষবাবু দেখতে পেলেন দুটো গুড়ির মাঝের গর্তে একটা বাদামি রঙের কুকুরের দুধ খাচ্ছে ঠিক মায়ের মতো দেখতে দুটো কুকুরছানা। দুটোই মেয়ের, বুড়ো বলল যে আর দুটো মদ কুকুরছানাও ছিল কিন্তু সেগুলো বাবুরা কিনে নিয়ে গেছে।

পরিতোষবাবু মনে মনে ঠিক করলেন, আর ঘোরাঘুরি নয়, একটা মেয়ে কুকুরছানাই নিয়ে যাব। আর কোথায় যেন তিনি শুনেছেন যে মাদি কুকুরেরাই

সবচেয়ে তেজি হয়। তিনি শান্ত গলায় বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলোর দাম কত?”

এবার বুড়ো একটু শয়তানি করল, “বাবু, দুটোই নেবেন?”

পরিতোষবাবু বললেন, “আরে না, দুটো দিয়ে কী করব? আপনি যে-কোনো একটার দাম বলুন।

বুড়ো বলল, এগুলো চার-পাঁচশো টাকা করে দাম, তবে এখন ভাঙা বাজার, আমাদের চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, আমি আপনাকে তিনশো টাকায় দেব।”

এই দাম শুনে পরিতোষবাবু কোনো রকম জবাব না দিয়ে মালতীকে নিয়ে রওনা হলেন। বুড়ো পেছন পেছন আসতে লাগল, “বাবু, চলে যাচ্ছেন কেন? যা হয় একটা দাম বলুন।

পঞ্চাশ টাকা বলতে একটু ইতস্তত লাগল, পরিতোষবাবু অনেক ভেবেচিন্তে তারপর মুখ ফুটে বলে ফেললেন, “সত্তুর টাকা হলে নিতে পারি।”

বুড়ো কী বুঝল কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে বলল, “পুরো একশো টাকা দিয়ে দিন, দুপুরবেলা দামাদামি করব না।”

পরিতোষবাবুর কেমন গো চাপল, বললেন, “আমি আশি টাকার বেশি দেব না।”

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বুড়ো আশি টাকাতেই রাজি হয়ে গেল। একশো টাকার নোটটা বুড়োকে দিয়ে পরিতোষবাবু মালতীকে বললেন, “দুটোর মধ্যে কোন্টা নেবে বেছে নাও।”

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলল, “না না, কুকুরের মায়ের কোল থেকে বাচ্চা তুলতে যাবেন না, নির্ঘাত কামড়ে দেবে। দাঁড়ান আমি দিচ্ছি, ঐ যেটার লেজের ডগাটা সাদা, ঐ ছানাটা দিই।”

সত্যিই, দুটো বাচ্চা হুবহু একরকম দেখতে হলেও একজনের লেজের ডগাটা সাদা। পরিতোষবাবু মালতীকে বললেন, “ঐ সাদাটুকু আমরা ফাউ পেলাম। ঐ ছানাটাই নেওয়া যাক।”

আর হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। গঙ্গার দিক থেকে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি আসছিল, হাত তুলতেই দাঁড়াল। দুজনে মিলে যখন ট্যাক্সিতে উঠলেন, তখন মালতীর কোলে। ছোট, নরম কুকুরছানাটা দু-চোখ বুজে গোল হয়ে গুটিয়ে ঘুমোচ্ছ।

কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সিটা বাড়ির দরজাতে দাঁড়াতেই ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নেমে কুকুরছানা নিয়ে মালতী মা'র কাছে ছুটে গেল, "মা, দ্যাখো, কী সুন্দর।" মনোরমা সদর দরজায় চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরিতোষবাবু ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে এলেন। তখনো মালতীর কোলে কুকুরছানা। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সে জানেই না, কোথা থেকে কোথায় এল।

যখন মালতী বলল, "মা, একটা প্লেটে করে ওকে একটু দুধ দাও, তখনই বাচ্চাটা একবার চোখ মেলে তাকাল, কী নরম টলটলে দুটো চোখ, তাতে কে যেন কাজল টেনে দিয়েছে।

চিলি-চিলি

নতুন কুকুরছানার নাম রাখা হল, 'চিলি'। কেন যে নামকরণ এরকম হল সেটা গুছিয়ে বলা খুব কঠিন।

কুকুরের নাম দিশি-বিলিতি দুরকমই চলে। দিশি নামের মধ্যে ভোলা, মেয়ে হলে ভুলু, তাছাড়া কালু, বাঘা, লাল ইত্যাদি, গায়ের রঙ অথবা বীরব্যাক নামের খুবই ছড়াছড়ি। আর বিলিতি নাম টাইগার, টম, হ্যাপি এগুলো খুবই জনপ্রিয়। তা ছাড়া লোকে শখ করে নানা রকম নাম রাখে। মৌ, সোনালি, ডার্লিং। পরিতোষবাবুদের দেশের বাড়িতে একটা কালো ঝলমলে কুকুর ছিল তাঁর ছেলেবেলায়, কেন যেন তার নাম ছিল কুতুবুড়ি। বড় ভালবাসার কুকুর ছিল কুতুবুড়ি, পরিতোষবাবুর মনে আছে কুতুবুড়ি যখন মারা গিয়েছিল তখন তাঁর বয়েস দশ-এগারো, এখনকার মালতীর চেয়ে একটু কম। কুতুবুড়ির জন্য খুব কেঁদেছিলেন পরিতোষ, দুদিন স্কুলে পর্যন্ত যাননি।

যা হোক নতুন কুকুরছানার তো একটা নাম দিতেই হবে। আর কুকুরের নাম দেওয়া খুব কঠিন। এমন নাম দিতে হবে যেনাম মানুষের হয় না, বিউটি, খুশি, আতা এসব নাম কুকুরের পক্ষে চমৎকার।

পরদিন ছিল ভূগোলের উইকলি টেস্ট, প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার দিন একটা করে টেস্ট হয় মালতীদের স্কুলে। কুকুরছানা কিনতে বাবার সঙ্গে বেরোনোর আগে কিছুক্ষণ বাধ্য হয়ে ভূগোলের বইটা পাতা খুলে নাড়াচাড়া করেছিল। হঠাৎ মালতীর খেয়াল হল চিলি নামে একটা দেশ আছে দক্ষিণ আমেরিকায়, চিলি, পেরু, ভেনেজুয়েলা কত রকম আশ্চর্য নামের দেশ, পড়তে যতটা না ভাল লাগে চোখ বুজে সে রকম সব দেশের কথা, সে সব চমৎকার জায়গার, বাড়িঘর, গাছপালা মানুষজনের কথা ভাবতে ভাল লাগে মালতীর। সেখানে হয়তো তারই মতো একটা মেয়ে আছে, সে হয়তো তার বাবার সঙ্গে গিয়ে আজই একটা কুকুরছানা নিয়ে এসেছে, বাদামি, উজ্জ্বল লোমে ভরা ঠাণ্ডা থাবা, ঠাণ্ডা নাকের একটা কুকুর যার লেজের ডগাটা একটু সাদা।

বাড়ি এসেই কুকুরছানাটা কিছুক্ষণ কুঁই-কুঁই করেছে। তাকে এক প্লেট দুধ দেওয়া হয়েছিল। মায়ের দুধ ছাড়া বোধহয় এতদিন কিছু খায়নি। দুধের প্লেটে কিছুতেই মুখ দেবে না। একবার জোর করে মুখটা মালতী প্লেটের মধ্যে গুজে দিল, কুকুরছানাটার নাকে, ঠোঁটে একটু দুধ লেগে গেল। ছানাটা গোলাপি জিভ বার করে নাক আর ঠোঁটটা চাটতে গিয়ে হঠাৎ দুধের স্বাদটা পেয়ে কেমন অস্থির হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে প্লেটটা চেপে ধরতেই প্লেটটা কাত হয়ে প্রায় পুরো দুধটা মেঝেতে গড়িয়ে গেল। তারপর নিজেই কী বুঝে আস্তে আস্তে মেঝে থেকে দুধটা বুভুক্ষুর মতো দ্রুত চেটে খেতে লাগল।

একটু পরে মালতী কুকুরছানাটা আবার কোলে নিয়ে একটু মেলাতেই সেটা আরামে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন মালতী সেটাকে কাগজের বাক্সে আলগোছে শুইয়ে দিল, অকাতরে ঘুমোতে লাগল সে।

মনোরমা মালতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার খিদে লাগেনি? তোমরা কি বাইরে কিছু খেয়েছিলে?”

মালতী বলল, “বাইরে কোথায় খাব মা? আমরা কি সময় পেয়েছি? এখান থেকে নিউ মার্কেট, নিউ মার্কেট থেকে হাতিবাগান, তারপর হাতিবাগান থেকে গঙ্গার ঘাট, আমি আর বাবা তো সারাক্ষণ ছুটেছি।”

যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। মনোরমা গজগজ করতে লাগলেন, “সারাক্ষণ রোদ্দুরে-রোদ্দুরে ছুটেছ। কোথাও একটু বিশ্রাম করে দুটো মিষ্টি তো খেয়ে নিতে পারতে। কুকুরছানা কেনার এত হাঙ্গামা জানলে আমি তোমাকে বাবার সঙ্গে পাঠাতাম না।”

একটু পরে মনোরমা বললেন, “এর থেকে রাস্তার কুকুরের একটা নাদুসনুদুস ভাল ছানা এনে পুষলেই হত। আর এটা যা এনেছ এটাও তো রাস্তার কুকুরেরই মতোই প্রায়। বড় হয়ে একদম নেড়ি কুকুরের মতো দেখতে হয়ে যাবে। এটার জন্যে একশোটা টাকা জলে গেল।

মা'র কথা শুনে মালতী রীতিমত রেগে উঠল, “মা, এটা তুমি ঠিক বলছ না। ও একেবারেই রাস্তার কুকুরের মতো দেখতে নয়, তুমি ওকে ভাল করে দেখইনি এখনো, শুধ-শুধু নিন্দে করছ।”

এই সময়ে পরিতোষবাবু বাথরুম থেকে বেরোলেন। মালতী ঠোঁট ফুলিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, “বাবা, আমরা নাকি নেড়ি কুকুর কিনে এনেছি?”

পরিতোষবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “পাগল নাকি? একশো টাকা দিয়ে কেউ রাস্তার নেড়ি কুকুর কেনে?”

মনোরমা বললেন, “ঠিক আছে বাবা, নেড়ি কুকুর নয়। খাঁটি বিলিতি কুকুর। এখন পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান করে এসো। দেখি, আমি ভাত বাড়ছি।”

আপাতত নেড়ি না বিলিতি এই প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। মালতী স্নান করতে গেল। তেল মাথায় দিয়ে মাথায় দু’মগ জল ঢালতেই মালতীর মনে পড়ল কাল ভূগোলের টেস্ট। গত বছর আনুয়ালে ভূগোলে সে খুব খারাপ করেছিল, মাত্র সাতচল্লিশ পেয়েছিল। ভূগোলটা ভাল হলে সে ক্লাসের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করত । তার বন্ধুরা অনেকেই তো পঁচাত্তর, আশি পর্যন্ত পেয়েছে। কালকেই এ বছররের প্রথম উইকলি টেস্ট ভূগোলের। দুপুরে শোবে না, সকালটা পড়া হয়নি, দুপুরে পুষিয়ে নিতে হবে। বিকালে আবার ছানাটাকে নিয়ে পার্কে যেতে হবে। হাতে একটা লাঠি রাখতে হবে, বড় কুকুরগুলো হঠাৎ যদি আক্রমণ করে, আর শিকল লাগবে, বকলস লাগবে। বাবাকে বলতে হবে গড়িয়াহাট বাজার থেকে সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসতে । গড়িয়াহাটে এসব পাওয়া যায় কি না কে জানে !

গড়িয়াহাটের পরেই মালতীর মাথায় এল আর্জেন্টিনা। কালকের পড়া হল আর্জেন্টিনা, চিলি, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে দুপুরে প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে পড়ে রাখবে, ও দুটো একটু সোজা আর রাতে আর্জেন্টিনা, চিলি।

চিলিতে একটা মেয়ে, তারই মতো খুব ছোট নয়, খুব বড়ও নয়, তার বাবা আজকে তাকে একটা কুকুরছানা কিনে দিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে

মুছতে বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে সহসা মালতী ভাবল, তাই তো চিলি, চিলি, চিলি।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে খাবার টেবিলে বসে বাবার সঙ্গে খেতে খেতে কুকুরছানার নাম রাখা নিয়ে অনেক কথা বলতে বলতে শেষে মালতী বলল, “বাবা, আমরা যদি কুকুরছানার নাম রাখি চিলি?”

পরিতোষবাবু বললেন, “ঠিক আছে। আগে দুরকম চিলি ছিল। চিলি মানে লঙ্কা, চিলি মানে দেশ। এখন আরো এক রকম যোগ হল, চিলি মানে কুকুরছানা।”

মালতী বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো সংশোধন করল, “চিলি মানে কুকুর। ও তো আর চিরদিন কুকুরছানা থাকবে না।”

এমন সময় কাগজের বাক্সে কুকুরছানার কুঁই কুঁই কান্না শোনা গেল। মালতী খাওয়া ফেলে ছুটতে যাচ্ছিল। মনোরমা এক ধমক লাগালেন, “খাবার ফেলে কোথায় যাচ্ছ? প্রথম দু-চারদিন ও রকম কান্নাকাটি করবেই । তারপর পোষ মেনে যাবে। তুমি খাও, খেয়ে উঠে পড়তে বোসে। সব সময় কুকুরছানা কুকুরছানা করলে চলবে না।”

মালতী দমে গিয়ে মাথা নিচু করে। চুপচাপ খেতে লাগল।

একটু পরে যখন হাত ধুয়ে পড়তে বসতে যাচ্ছে, কুকুরছানাটা তখন আর কাঁদছে না। মালতী কাগজের বাক্সের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, কুকুরছানাটা কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর দুই চোখের কোল কেমন ভেজা-ভেজা। আহ, ওর মায়ের জন্যে বোধহয় মন কেমন করছে!

কুকুরছানাটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মালতী আস্তে-আস্তে ডাকল, “চিলি, এই চিলি, চিলি, চিলি।”

চিলির প্রথম দিন

মালতীদের বাড়িতে চিলি যখন প্রথম এল তখন তার বয়েস একমাস কি বড়জোর পাঁচ সপ্তাহ। চিলিকে পোষা আরম্ভ করার আগে কুকুর বিষয়ে যে বইটা পরিতোষবাবু কিনেছিলেন, তাতে কুকুরের বয়েস সম্পর্কে চমৎকার একটা আলোচনা আছে।

কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বড় অসুখ-বিসুখে মারা না গেলে একজন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে সত্তর-আশি বৎসর বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সে জায়গায় একটা কুকুরের জীবন পনেরো-বিশ বছরের বেশি হয় না।

মানুষের আয়ুর হিসেবে কুকুরের আয়ু হিসেব করে কুকুরের বয়েস বার করবার একটা মজার অঙ্ক আছে এই নতুন বইটায় । কুকুরছানার প্রথম ছয় মাস ধরতে হবে মাসে দেড় বছর করে। দু-মাস বয়েসের একটা কুকুরছানা তিন বছর বয়েসের একটা মানুষের বাচ্চার সমান। শারীরিক বৃদ্ধিতে এবং বুদ্ধির হিসেবে ছয়মাস বয়েসের কুকুর নয় বছর বয়েসের বালকের সমান-সমান।

এর পরের ছয় মাস, একেক মাস এক বছর করে। এই ছয় আর ছয়, বারো মাস অর্থাৎ এক বছর বয়েসী কুকুরের বাচ্চা পনেরো বছরের কিশোরের সমান।

কুকুরছানার যখন দু'বছর পূর্ণ হল, তখন সে আর ছানা রইল না, তখন তার বয়েস হয়েছে মানুষের হিসেবে চব্বিশ বছর, তখন সে পূর্ণ যুবক। দ্বিতীয় বছরে মানুষের জীবনের অঙ্কে তার নয় বছর যোগ হয়েছে। এর পরে অবশ্য সে আর বাড়বে না, তবে তাড়াতাড়ি বুড়ো হবে। দু'বৎসর বয়েসের পর থেকে তার একেকটা বছর মানুষের চার বছরের সমান।

পরিতোষবাবু মালতীকে দিয়ে হিসেবটা করালেন। তিন বছর বয়েসী একটা কুকুর মানুষের সঙ্গে তুলনায় তার বয়েস কত? মালতীর মাথা কিন্তু পরিষ্কার, সে চট করে হিসেব করে দিল, আটাশ বছর। সেই রকম দশ বছর বয়েসী একটা কুকুর আসলে ছাপ্পান্ন বছরের মানুষের সমান। তার রিটায়ার করার সময় প্রায় হয়ে গেছে।

আবার কুকুরদের মধ্যে যদি ভোট হয়, একটা কুকুর এক বছর আট মাস বয়েস হলেই ভোট দিতে পারবে, তখন তার বয়েস হবে একুশ বছর, সে তখন প্রাপ্তবয়স্ক বলে মর্যাদা যাবে।

কিন্তু মালতী এই মুহুর্তে চিলির বয়েস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার সামনে এখন চিলিকে নিয়ে অনেক সমস্যা।

ছয়ই ফেব্রুয়ারি, রোববার দিন দুপুরে চিলিকে নিয়ে আসা হল। ঐ দিনের তারিখে মালতীদের বাইরের ঘরে যে বড় ক্যালেণ্ডার আছে তাতে মালতী গোটা-গোটা হাতের অক্ষরে লিখে রেখেছে। আজ আমাদের কুকুরছানা এল।

তার নীচেই আরেক জায়গায় লিখেছে কুকুরছানার নাম রাখা হল চিলি।

পরিতোষবাবু তাঁর ছোটখাটো দরকারি টুকটাক দেয়ালে কালেণ্ডারের গায়ে লিখে রাখেন যাতে চোখের সামনে থাকে, ভুলে

যান। বাবাকে দেখে মালতীও এই রকম লিখেছে।

মালতীর উৎসাহ দেখে মনোরমা দেবী তাঁর ড্রয়ার থেকে একটা খুব সুন্দর লাল চামড়ায় বাঁধানো বিলিতি ডায়েরি বার করে দিয়ে মালতীকে বলেছেন, “তুমি তোমার কুকুরছানার সব কথা এর মধ্যে লিখবে। এই খাতাটার নাম দাও ‘চিলির জীবনী’। যা-যা মজার ঘটনা, মনে রাখার মতো ব্যাপার চিলি করবে, সব এ-খাতায় লিখে রাখবে।” ।

এই লাল রঙের খাতাটার উপর অনেক দিন ধরেই মালতীর খুব লোভ ছিল। খাতাটা পেয়ে সে খুব খুশিই হল, কিন্তু সে বেশ চালাক মেয়ে, মায়ের কায়দাটা সে বেশ ধরতে পেরেছে, তাই মুখে বলল, “মা, তোমার সব সময় চেষ্টা আমাকে সুকৌশলে লেখাপড়া করিয়ে নেবার।”

দুদিন আগেই স্কুলে বাংলা ক্লাসে মালতী ‘সুকৌশলে' শব্দটি দিয়ে বাক্যরচনা শিখেছে, এখন সুযোগ পেয়ে শব্দটা সে চমৎকার ব্যবহার করল। তার পর লাল খাতাটা খুলে নিজের বুদ্ধিমতো খাতাটার নাম লিখল-

চিলির চঞ্চলতা

By

Miss Malati Sengupta

কেন যে ইংরেজিতে ‘বাই মিস মালতী সেনগুপ্ত’ লিখল তা অবশ্য বলা কঠিন, হয়তো মালতী নিজেও জানে না।

রবিবার বিকেলেই পরিতোষবাবু গড়িয়াহাট বাজার থেকে একটা বাচ্চা কুকুরের বকলস আর একটা শিকল কিনে আনলেন। বকলসটায় কিন্তু ঘুঙুর লাগানো নেই আর সাইজেও একটু বড়, শেষ ফুটোতে আটকালেও চিলির গলায় ঢলঢল করে। পরিতোষবাবু ঠিকমতো আরেকটা বেশি ফুটো করে দিয়ে বললেন, “ভাল ঘুঙুর লাগানো বকলস নিউ মার্কেট থেকে কিনে আনতে হবে। আপাতত এটায় কিছুদিন চলুক। আরেকটু বড় হলে গলার মাপ নিয়ে মানানসই বকলস কিনে আনব।”

এ সবই ঠিক আছে। কিন্তু ছোট্ট চিলির জন্যে যে লোহার শিকলটা নিয়ে আসা হয়েছে সেটা বড় বেশি ভারী, গলায় দিলেই চিলি নেতিয়ে পড়ছে। মনোরমা বললেন, “ও যখন বড় হবে তখন শিকল লাগবে, শিকল দিয়ে বেঁধে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, বাড়ির মধ্যে তো শিকল লাগছে না। আর এর মধ্যে যখন পার্কে বা রাস্তায় নিয়ে যাবে তখন কোলে করেই নিয়ে যাবে।”

তাই হল, বাপ বকলস নিয়ে আসবার একটু পরেই চিলির গলায় বকলস দিয়ে মালতী তাকে কোলে করে বাবার সঙ্গে রাস্তায় বেরুল।

ইতিমধ্যে পাড়ার অনেকেই জেনে গেছে যে, মালতীর কুকুরছানা এসেছে । দু-একজন ছেলেমেয়ে এসে জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখেও গেছে। এখন মালতীর কোলে দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সোনালি রেশমের মতো লোম, চোখের কোণে গভীর কাজল টানা, মায়াবী সরল চোখ যে দেখে সেই চিলিকে কোলে নিতে চায়।

কেউ-কেউ জানতে চাইল, “কোথায় পেলেন?” “এটা কী কুকুর?” পরিতোষবাবু বিশেষ কিছু জবাব দিলেন না। রাস্তা দিয়ে এক অচেনা ভদ্রলোক

যাচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে চিলির ঠাণ্ডা নাকটা আঙুল দিয়ে একটু ছুঁয়ে মুখটার দুধদুধ গন্ধ শুকে মালতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খুকি, এটা কি গোল্ডেন রিট্রিভারের ছানা?"

মালতী কিছু বলার আগেই পাশ থেকে পরিতোষবাবু বললেন, "সেটা ঠিক বলতে পারব না। আমরা আজকেই এনেছি।"

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়ে চিলিকে আরেকটু খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটার বয়েস কত হবে?"

পরিতোষবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তা মাসখানেক হবে। এখনো তো মায়ের দুধ ছাড়েনি।" একটু আগের হিসেব অনুযায়ী মালতী এর মধ্যে ফস করে বলল, "কুকুরের বাচ্চার মাসখানেক মানে মানুষের বাচ্চার দেড় বছর ।"

ভদ্রলোক কিছু বুঝতে পারলেন কিনা কে জানে? একটু অবাক হয়ে মালতীর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর প্রায় নিজের মনেই বললেন, "না, গোল্ডেন রিট্রিভার নয়, গোল্ডেনের বাচ্চা এক মাসে এর চেয়ে অনেক বড় হত।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। একটু পরে মালতী বলল, "বাবা, তোমার নতুন বইটায় ঐ কী বলল, গোল্ডেন না কী, তার ছবি আছে?"

পরিতোষবাবু বললেন, "চলো বাড়ি গিয়ে দেখছি। এখন অন্ধকার হয়ে আসছে। একটু ঠাণ্ডাও আছে। তোমার আর চিলির ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

মালতী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, চিলিরও কি ঠাণ্ডা লাগতে পারে?"

পরিতোষবাবু কালকে রাতেই বইটা পড়েছেন, বললেন, "হ্যাঁ, জ্বর সর্দি, নিউমোনিয়া সবই কুকুরের হতে পারে, অনেক কুকুর তাতে মারাও যায়।"

বাড়ি ফিরে লোডশেডিং চলছে। মালতীর পড়ার টেবিলে মনোরমা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। মালতী চিলিকে কাগজের বাক্সে রেখে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসল। প্রথমে ভূগোল, কালকের উইকলি টেস্টের পড়াটা ভাল করে করতেই হবে তবে তার আগে কুকুরের নতুন বইটা থেকে গোল্ডেন রিট্রিভারের ছবিটা দেখে নিতে হবে।

চিলি বড় হচ্ছে

সেই রাতে চিলি কিছুতেই কাগজের বাক্সে ঘুমোল না। কোলে বেশ থাকে, কোল থেকে নামিয়ে কাগজের বাক্সে শুইয়ে দিলেই কুঁকুঁ করে গোঙাতে থাকে। সেই গোঙানিতে যদি কেউ সাড়া না দেয় তখন তীক্ষ্ণ কুঁই কুঁই করে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে।

মনোরমা মানে মালতীর মা রীতিমত চটে গেলেন। বললেন, "এ তো মহাঝামেলা হল, সারাদিন খাটাখাটনির পরে একটু ঘুমোব, তা না কুকুরের বাচ্চার পরিত্রাহি চেঁচানি। এটাকে রাস্তায় ফেলে দিলেই ভাল হয়।"

মালতী মাকে মনে করিয়ে দিল, "মা, তুমিই তো দুপুরবেলায় বলেছিলে দু-একদিন কাঁদবে-টাঁদবে তারপর পোষ মেনে যাবে। তা হলে এখন রাগ করে ফেলে দেবে বলছ কেন?"

মালতীর গলার স্বরে রীতিমত অভিমানের ছাপ। মনোরমা নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে বললেন, "ফেলে দেব না। কিন্তু ওকে কান্না থামাতে বলো।"

মালতী, কিছু না বলে চুপচাপ উঠে গিয়ে চিলিকে তুলে কোলে করে তার বিছানায় নিয়ে এসে শুল। কোলবালিশ আর মালতীর কোলের মধ্যে ঘন আরামে চিলি। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মনোরমা বললেন, "কুকুর বড় নোংরা জীব। বিছানায় ওঠানো অভ্যাস করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।"

মালতী কিছু বলল না, চুপ করে রইল। একটু পরেই চিলির শরীরে দুটো হাত চাপা দিয়ে সে নীরবে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মালতী দেখে বিছানায় বা ঘরে কোথাও চিলি নেই। মা বাথরুমে, বাবা বোধহয় দুধ আনতে গেছেন।

কাগজের বাক্সটায় চিলি নেই। খাটের নীচে, আলনার পিছনে চিলি নেই। মালতী খুব ভয় পেয়ে গেল। মা তা হলে কি রাস্তায় ফেলে দিল কুকুরছানাটাকে।

এমন সময়ে নাড়ুর মা বলে যে মহিলা সকালবেলা দু-ঘন্টার জন্যে বাসনমাজা, ঘরমোছা, উনুন ধরানো এই সব ঠিকে কাজের জন্যে মালতীদের বাড়িতে আসে, তার ভাঙা কাঁসার থালার মতো খনখনে গলা পাওয়া গেল বারান্দায়, “আরে সর্বনাশ ! এটা আবার জুটল কোত্থেকে?”

মালতী ছুটে গিয়ে দেখে বারান্দায় সিঁড়ির কাছে চিলি ঘোরাঘুরি করছে, সে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে নাড়ুর মা চেঁচিয়ে উঠল, “আরে। সর্বনাশ ! নোংরা জিনিস, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না । কোল থেকে নামিয়ে দাও এখনই।”

মালতী বলল, “নামিয়ে দেব কেন? এটা তো কালকে আমরা একশো টাকা দিয়ে। কিনে এনেছি।”

নাড়ুর মা বলল, “আরে সর্বনাশ ! আমার নিজের দামই তো একশো টাকা হবে না।”

এর মধ্যে পরিতোষবাবু শূন্য বোতল হাতে ফিরে এলেন । আজ হরিণঘাটার দুধ আসেনি। মালতী কোনোদিন দুধের ব্যাপারে কথা বলে না, সে নিজে দুধ খেতে পছন্দও করে না কিন্তু আজ বলল, “তা হলে বাবা, চিলি কী খাবে?”

পরিতোষবাবু বললেন, “চায়ের জন্যে গোয়ালার কাছ থেকে দুধ একটু নিতেই হবে। চিলির জন্যে কিছুটা বেশি নিলেই হবে। তুমি পড়ার টেবিলে বসে একটু বাইরের দিকে খেয়াল রেখো। এখনই গোয়ালা পাড়ায় আসবে।”

কিছুক্ষণ পরে বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পরিতোষবাবুকে এসে মালতী বলল, “বাবা, সামনের বাড়ির সামনে গোয়ালা গোরুটা বেঁধেছে।” পরিতোষবাবু একটা বড় বাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি এগুলেন। ঠিক তখনই মালতী বাবাকে বলল, “বাবা চিলিকে কি দাঁত মাজাব, মুখ ধোয়া?” পরিতোষবাবু হেসে বললেন, “না হে, কুকুরদের দাঁত মাজার, মুখ ধোয়ার দরকার পড়ে না। বরং তুমি ওকে আমার কাছে একটু দাও। আমি ওকে দুধ নেবার সময়ে ফুটপাথে ছেড়ে দিয়ে বাথরুম করিয়ে আনি।”

এইদিন থেকেই প্রায় পাকাপাকি নিয়ম হয়ে গেল, সকালবেলা চিলি পরিতোষবাবুর সঙ্গে দুধ আনার সময় বেরোয়। পরিতোষ হাতে একটা ছোট লাঠি নেন, যাতে রাস্তার কোনো কুকুর হঠাৎ চিলিকে আক্রমণ না করে ।

আগের দিন রাতে লণ্ঠনের আলোয় গোল্ডেন রিট্রিভারের ছবি দেখেছিল মালতী। আজ ইস্কুল থেকে ফিরে এসে প্রসন্ন মনে চিলিকে টেবিলের উপর বসিয়ে তার সামনে কুকুরের বইটা খুলে ধরল। আজ মালতীর ভাগ্য ভাল, নইলে ভূগোলের মিস্ আসেননি, উইকলি টেস্ট হয়নি। হলে খুব সুবিধে ছিল না, প্রায় কিছুই পড়া করা ছিল না।

কুকুরের বইটায় একটা পাতা জুড়ে রঙিন ছবি রয়েছে গোল্ডেন রিট্রিভারের। সোনালি রঙের, ঝলমলে বিরাট রাজকীয় কুকুর এটা, পাশে দুটো চমৎকার ছানা নিয়ে বসে রয়েছে। চিলি অনেকটা ঐ ছানাদুটোর মতোই দেখতে কিন্তু ছবির ঐ কুকুর আর কুকুরছানা দুটো অনেক বেশি সুন্দর।

কালকের ভদ্রলোকের কথা মালতীর মনে পড়ল। চিলি গোল্ডেন রিট্রিভার নয় ঠিকই, তবে তারই কাছাকাছি কোন পাহাড়ি বা জংলি জাতের কুকুর।

অবশ্য মালতীর তাতে কিছুই আসে যায় না। চিলি তার চিলিই, সে যাই হোক না কেন, সে তার নিজের সবচেয়ে ভালবাসার কুকুরছানা।

পরদিন থেকে চিলির জীবনধারায় একটা অলিখিত বাঁধা রুটিন চালু হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিতোষবাবুর কোলে উঠে দুধ আনতে যাওয়া, তারপর ফিরে এসে সবাই যখন চা খাচ্ছে তখন খাবার টেবিলের নীচে বসে থাকা। এই সময় তাকে তার প্লেটে অল্প একটু দুধ দেওয়া হত। কিন্তু দু'দিন পরে পরিতোষবাবু চা খেতে-খেতে তার প্লেটে নিজের পেয়ালা থেকে একটু চা ঢেলে দিলেন। ও মা, সঙ্গে সঙ্গে চিলি চাটুকু চুকচুক করে খেয়ে নিল। প্রথমে চুমুক দিতে গিয়ে একটু গরম লেগেছিল, তাড়াতাড়ি ভয়ে চার পা পিছিয়ে গিয়েছিল কিন্তু একটু পরে ধাতস্থ হয়ে আবার প্লেটটার কাছে এগিয়ে এসে ধীরস্থিরভাবে চাটুকু চেটে চেটে খেল।

চিলির এই বিচারবুদ্ধি দেখে মালতী হাততালি দিয়ে উঠল। একটু পরে চা খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে প্রথমেই লাল ডায়েরিটা খুলে লিখল। ৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার। আজ চিলি প্রথম চা খেল।

এই লাল ডায়েরিটা যার নাম মালতী দিয়েছে "চিলির চঞ্চলতা', তার আগের দুই পাতায় লেখা আছে ৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার। আজ চিলি একা-একাই দুপুরেবেলা মেজেতে ঘুমিয়েছে। কাগজের বা টপকে সে চলে এসেছিল।

৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার আজ সকালে চিলি ঘুম থেকে উঠে বাবার সঙ্গে দুধ নিয়ে। এসে যখন আমাকে দেখতে পেল, আমাকে। দেখে আহ্লাদে লেজ নাড়ল। চিলির এই প্রথম লেজনাড়া।

(মালতীর খাতায় একটু-আধটু বানান ভুল, কাটাকুটি আছে। মালতী যাতে সকলের কাছে লজ্জা না পায় সেই জন্যে একটু ছোটখাটো ভুলত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া হল ।)

চিলির লেজ নাড়ার ব্যাপারটা এখানে আগে লিখে নিই। চিলি সেই যে প্রথম গঙ্গার ঘাট থেকে এল তারপর থেকে তার লেজ সব সময়েই গোটানো, সব সময়ে সে যেন শঙ্কিত, অচেনা পরিবেশে সর্বদাই তার ভয় সব কুকুরছানারই অন্য বাড়িতে এসে গোড়ার দিকে দু-চারদিন এমন হয়। তারপর ঘরদোর, মানুষজনদের চিনে ফেলে, তখন আর তার ভয় থাকে না।

চিলির মধ্যেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাব আসতে লাগল। সেই স্বাভাবিকতার প্রথম উদাহরণ হল ঐ মালতীকে দেখে লেজ নাড়া।

আনন্দে, আহ্লাদে কুকুরেরা যেমন লেজ নাড়ে, তেমনি ভয়ে, রাগে, উত্তেজনায় অনেক কুকুরই লেজ নাড়ে। যারা কুকুর পোষে, কুকুরের ব্যবহার চেনে, তারা এটা সহজেই বুঝতে পারে। অন্যেরা ভুল করে অনেক সময়ে কুকুরের মেজাজ বুঝতে না পেরে তার কামড় খায়।

ইতিমধ্যে চার-পাঁচদিনের মাথায় দেখা গেল চিলি চমৎকার বিস্কুট খেতে পারে। এক টুকরো থিন অ্যারারুট বিস্কুট তাকে দিলেই সে সেটা মুখে করে

দৌড়ে খাটের নীচে পালিয়ে যাচ্ছে, যেন কেউ সেটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। তারপর চিকন, নতুন দাঁত দিয়ে সেই বিস্কুটের টুকরোটা কুটকুট করে ভেঙে খেতে লাগল।

তবে দুধভাত দিলে দুধটুকু চেটে খেয়ে নিচ্ছে, প্লেটের নীচে ভাতটুকু পড়ে থাকছে সেটা বিশেষ খাচ্ছে না। আর দুধরুটি দিলে দুধ তো বেশি পাচ্ছে না, কারণ রুটি দুধ শুষে নিচ্ছে। তখন একটা করে রুটির টুকরো মুখে করে দৌড়ে খাটের নীচে গিয়ে লুকিয়ে খেয়ে ফেলছে, তারপর আস্তে আস্তে এসে আর একটা নিয়ে আবার দৌড়ে লুকিয়ে পড়ছে।

দু-একদিন পরে ঘর ঝাড় দিতে গিয়ে নাড়ুর মা খাটের পায়ের নীচ থেকে, আবার আলমারির পিছন থেকে কয়েকটা শুকনো রুটির টুকরো, এক ফালি ভাঙা বিস্কুট এ পেল, নাড়ুর মা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে লাগল, "আরে সর্বনাশ! কুকুরটা তো বাড়িঘর নোংরা করা আরম্ভ করেছে।"

কিন্তু নাড়ুর মা কি বুঝবে? চিলি খাবার লুকিয়ে রাখছে, যাতে অন্য কেউ ভাগ না বসায়, যখন খাবার থাকবে না তখন খাওয়ার জন্যে। এই স্বভাব ওর রক্তের মধ্যে রয়েছে।

সকাল সাড়ে নটা নাগাদ পরিতোষবাবু অফিস যান, সাড়ে-দশটায় ইস্কুলে যায় মালতী। দুজনকেই সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে চিলি। তারপর দুধরুটি খেয়ে ঘুম। এই সময়টা সে শোবার ঘরে পাপোশের উপরে শুয়ে থাকে। বাথরুম, রান্নাঘর, বারান্দা থেকে মনোরমা যখনই শোবার ঘরে আসেন যান, চিলি ঘুমিয়ে না থাকলে মনোরমাকে দেখলে সসঙ্কোচে লেজ নাড়ে। সে যেন কেমন করে টের পেয়েছে ইনিই এ বাড়ির কর্ত্রী, ঐরই দয়ায় এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, বসবাস।

বিকেলে মালতী আগে ফেরে। ফেরার কিছু আগেই চিলি টের পেয়ে যায়। বোধহয় গায়ের গন্ধ পায়। মালতীকে ইস্কুলের বাস রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দেয়। হেঁটে আসতে প্রায় দেড়-দুই মিনিট লাগে, বাড়িতে পৌঁছনোর আগেই চিলি দ্রুত

লেজ নাড়তে নাড়তে বাইরের ঘরের দরজার কাছে ছুটে যায়, উত্তেজিতভাবে বন্ধ দরজাটা নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকে।

চিলির চাঞ্চল্য দেখে মনোরমাও টের পান মালতী এসে গেছে। দুপুরের আলগা ঘুম তাঁর ভেঙে যায়, তিনি উঠে গিয়ে মেয়েকে দরজা খুলে দেন।

তারপর পরিতোষবাবু ফেরেন, তাঁকেও অভ্যর্থনা জানায় চিলি, তারপর তাঁর সঙ্গে একটু বিস্কুট আর একটু চা খায়। সন্ধ্যার সময় মালতী তাকে নিয়ে একটু রাস্তায় হাঁটে। পরিতোষবাবু বলে দিয়েছেন আরেকটু বড় হলে পার্কে নিয়ে যাবে। পার্কে অনেক বড় বড় কুকুর আসে। হঠাৎ বাচ্চা কুকুর দেখে কামড়ে দিতে পারে।

রাতে দুধভাত। আস্তে আস্তে চিলি দুধের সঙ্গে ভাতটাও খাওয়া ধরেছে। কিন্তু এখনো রাতে শোবার সময় তার চেষ্টা মালতীর কাছে শোওয়া। তবে জোর করে কাগজের বাক্সের বিছানায় শুইয়ে দিলে বিশেষ আপত্তি করে না।

চিলির চঞ্চলতা

কিছুদিনের মধ্যেই কাগজের বাক্সটা চিলির পক্ষে ছোট হয়ে গেল। তা ছাড়াও ছিড়ে গেল মাঝ বরাবর। পরিতোষবাবু গোরুর খাটাল থেকে আনতে পারেননি, নাড়ুর মাকে পঞ্চাশটা পয়সা দিয়ে মোড়ের খড় কাটার কল থেকে খানিকটা খড় নিয়ে আসা হয়েছিল যাতে চিলির বিছানাটা গরম থাকে।

কিন্তু চিলি যেমন বড় হতে লাগল, তেমনি গরম পড়তে লাগল, ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে মার্চের গরম আরম্ভ হয়ে গেল। চিলি আর কাগজের বাক্সে শুতে চায় না। তার পছন্দ শোবার ঘরের লাল সিমেন্টের ঠাণ্ডা মেজে।

চিলি মালতীদের বাড়িতে আসবার পর ঐ প্রথম দু-একদিন কুইকই করে কাঁদা ছাড়া আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না। কোনো রকম শব্দ না, ঘেউ-ঘেউ, হাউ-হাউ কোনো রকম শব্দ না।

ব্যাপারটা নাড়ুর মা পর্যন্ত লক্ষ করেছে, "আরে সর্বনাশ! এ কুকুরটা বোবা নাকি? একবারও একটু ট্যাঁ-ফোঁ করে না।"

সত্যি ব্যাপারটা খুব বেমানান। চিলি ঘুরছে, ফিরছে, খাচ্ছে, দাচ্ছে, সকলের পায়ে ঘুরছে, লেজ নাড়ছে কিন্তু মুখে কোনো বাক্য নেই।

অবশেষে একদিন সেই অসম্ভব ঘটনা ঘটল। মালতী ইস্কুলে, পরিতোষবাবু অফিসে, খালি বাড়ি। মনোরমা রান্নাঘর রান্না করছেন, বেলা সাড়ে এগারোটা হবে। এই সময় থেকে সারা পাড়াটা কেমন নিঝুম হয়ে থাকে। এমন সময় সদর দরজায় কারা যেন কড়া নাড়ল। রান্নাঘরের বারান্দায় মনোরমার দিকে মুখ করে বসে ছিল, সদর দরজায় শব্দ হতেই চিলি বাইরের ঘরের দিকে ঘৌ-ঘৌ করে ছুটে গেল। এইটুকু বাচ্চা কুকুর কিন্তু গলা যে শঙ্খের মতো।

মনোরমা চিলিকে যে খুব ভালবাসেন তা নয়, অন্তত মালতী বা মালতীর বাবা যে রকম চিলিকে ভালবাসে, পছন্দ করে তিনি তা করেন না। কিন্তু আজ ক্ষুদ্র চিলির এই বিক্রম দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

মনোরমা বাইরের ঘরে গিয়ে দেখেন কী করে চেয়ার বেয়ে মালতীর টেবিলের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে চিলি। সেখানে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। বাইরের জানলার বাইরে বেশ শঙ্কিতভাবে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বখাটে ছেলে, তাদের হাতে চাঁদার খাতা।

সন্ধ্যাবেলা মনোরমার মুখ থেকে মালতী ও পরিতোষবাবু চিলির এই সাহস ও সংগ্রামী মনোভাবের কাহিনী শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। প্রকৃত অর্থে আজ থেকে চিলি কথা বলতে শুরু করল, শুধু দুপুরবেলা চাঁদা আদায়কারীদের বিরুদ্ধে নয়, অপরাহ্ণ মালতী ও পরিতোষবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন শুধু দৌড়ে গিয়ে বা লেজ নেড়ে নয়, বেশ হে-হে করে সে তার প্রভুদের অভ্যর্থনা জানাল।

এই উন্নতির পুরস্কারস্বরূপ পরিতোষবাবু পাশের লালার দোকান থেকে দুটো লেড়ো বিস্কুট এনে চিলিকে উপহার দিলেন।

পরে রবিবার দুপুর বাড়িতে মাংস রান্না করা হয়েছিল। টেবিলের নীচে চিলি শুয়ে আছে । একটু আগেই সে দুধরুটি খেয়েছে। তেল-মশলা দিয়ে রান্না মাংস চিলিকে দেওয়া উচিত হবে কি না এই ভেবে পরিষেবাবু বলেছেন, “এখন দরকার নেই, আরেকটু বড় হোক।” মালতীর মাংসের সঙ্গে চর্বি খেতে একদম অপছন্দ। অথচ আজকের মাংসটায় বড় বেশি চর্বি। মালতী খেয়ে উঠে আঁচাতে যাওয়ার সময় সেই চবি একটু চিলির মুখের সামনে ফেলে দিল। যত ছোটই হোক, হাজার হলেও কুকুর তো ! মাংসের গন্ধে উত্তেজিত, এক গ্রাসে চিলি চর্বির টুকরোটা গিলে ফেলল।

কিন্তু তারপরেই ভয়ংকর ছটফটানি। হাঁফাতে লাগল, ছুটতে লাগল, কী রকম যেন অস্থির হয়ে পড়ল। মালতী ও তার বাবা দুজনেই বেশ ঘাবড়িয়ে গেলেন, “কী হল? গলায় চর্বিটা আটকে গেল নাকি?”

মনোরমাদেবীর তখনো খাওয়া হয়নি। তিনি কিন্তু নিদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন, “ওর বিশেষ কিছু হয়নি। ওকে একটু জল দাও। ওর ঝাল লেগেছে। বাচ্চা তো, দুধের

মুখ, তাই অত ঝাল খেয়ে ছটফট করছে।” তারপর মালতীকে দিলেন এক ধমক, “তোমাদের আহ্লাদেই কুকুরটা মারা পড়বে। কেন ওকে ঝাল খেতে দিলে।”

পরিতোষবাবু বললেন, “সামনের সপ্তাহ থেকে এর জন্যে মাংসের ছাঁট নিয়ে আসবো। শুধু অল্প নুন আর হলুদ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে দিও, তাই খাবে।”

মালতী বলল, “বাবা, হলুদ খেলে ও ছটফট করবে না।” পরিতোষবাবু বললেন, “না, আর একটু হলুদ ওর শরীরের পক্ষে ভালই হবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, পোকা-টোকা হবে না।”

মালতীদের এই বাড়িটা থেকে বাজার বেশ একটু দুরে। সকালবেলা কিছু তরকারিওলা, কিছু মাছওলা রাস্তা দিয়ে ফেরি করে যায়।

তরকারিওলাদের ব্যাপারে চিলি নির্বিকার, কিন্তু দূরে যেই রাস্তায় কোনো প্রান্তে হাঁক শোনা যায়, “চাই মাছ, মাছ চাই, ইলিশমাছ, রুই মাছ,” চিলি অস্থির, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আসলে এই মাছওলাদের ডাক, মাছওলাদের আগমন, মাছ কেনা বা দামদর করা হলে বাড়ির সামনের সিঁড়িতে তাদের মাছ নামানো সব জিনিসটা চিলির রক্তের মধ্যে কী রকম উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

পরিতোষবাবুর ধারণা চিলি যে জাতের কুকুর সেটা এসেছে কোনো জোলো, মেছো এলাকা থেকে। কাঁচা মাছের গন্ধের সঙ্গে তার মনের নিবিড় আত্মীয়তা।

দূরে, গলির শেষ প্রান্তে কি অন্য গলিতে যে মুহূর্তে মাছওলার ডাক শোনা যায় চিলি ছুটে গিয়ে মালতীর টেবিলে দাঁড়িয়ে জানলার বাইরে চঞ্চল হয়ে তাকাতে থাকে। মাছও যত বাড়ির কাছে আসে তার আকুলি-বিকুলি তত বেড়ে যায়। যদি কোনো দিন বাইরের দরজা খুলে মাছ কেনা হয়, সে দিন তো চূড়ান্ত অবস্থা। মাছওলাকে ঘিরে চিলি লাফাতে থাকে, ঘৌ-ঘৌ করতে থাকে। সব মাওলা এ রকম পছন্দ করে না, কেউ কেউ ভয় পায়। আবার অনেকে খুব খুশি হয়।

এমনি তো চিলি কিন্তু বাসায় স্নান করতে চায় না। ঠিক হয়েছিল সপ্তাহে একদিন ওকে স্নান করানো। পরিতোষবাবু ডগ-সোপ কিনেও এনেছিলেন। কিন্তু

প্রথম দিন স্নান করানোর পর থেকে দেখা যায় সে আর স্নান করতে মোটেই রাজি নয়। বাথরুমের কাছে নিয়ে গেলে বা জলের বালতি বারান্দায় নিয়ে এলেই সে বেঁকে বসে, খাটের নীচে শেষ প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়ে ঘেউ-ঘেউ করে প্রতিবাদ জানায়। ডগ-সোপটাও চিনে ফেলেছে, মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে ডগ-সোপটা হাতে নিয়ে মালতী খ্যাপায়, "চলো চিলি, স্নান করবে?" আর সঙ্গে সঙ্গে চিলি এক দৌড়ে খাটের নীচে।

অথচ এখানে খোলামেলা জলে চিলির ফুর্তি দেখার মতো, যে- কোনো কুকুরের পক্ষে অস্বাভাবিক। চিলি যখন ছুটছিল লেকের ধারে অন্য যে লোকেরা হাঁটছিল তারাও খুব অবাক হয়ে কুকুরছানার এই জলক্রীড়া দেখছিল, একজন মোটাবুদ্ধির লোক আরেকজন মোটাবুদ্ধির লোককে বলল, "দেখছ, কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সরে এসো, এখনি জল থেকে উঠে এসে কামড়াবে।"

চিলি অবশ্য কাউকে কামড়ায়নি, শান্ত ভাবেই পরিতোষবাবুর কোলে উঠে পরে কিছুটা হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। তবে পরিতোষবাবুর জামায় শ্যাওলা, কাদা লেগে নোংরা হয়ে গিয়েছিল। তবে সেই সঙ্গে চিলির রক্তে জলের ও মাছের রহস্যটা একটু বোঝা গিয়েছিল।

সপ্তাহে একবার করে চিলির জন্যে মাংসের ছাঁট আনা হতে লাগল। কেন যেন মাংসের দোকানদাররা কুকুরের খাওয়ার মাংসের ছাঁট দিতে চায় না, পরিতোষবাবু বলেন, "আজকাল আর মাংসের ছাঁট বলে কিছু নেই। যা কিছু ছাল, চামড়া, ছিবড়ে, টেংরি সব মাংস কিংবা কিমার মধ্যে চালিয়ে দেয়।"

তবু একটু চেষ্টা করে দু-চার দোকানে অনুরোধ করে পঞ্চাশ পয়সার মাংসের ছাঁট কিনে আনেন পরিতোষবাবু । শালপাতার ঠোঙায় এই এতটুকু হাড়ের টুকরো, নাড়িভূঁড়ি, ছিবড়ে। কিন্তু তাতেই চিলি উৎফুল্ল। মাংস আনামাত্র সে টের পায়, একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে কখন সেটা রান্না করা হবে তার জন্যে। রান্না মানে, মনোরম দুটো রুটি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে, একটা আলু, একটু হলুদ-

নুন অনেকটা জলে উনুনে। সব কাজ মিটে যাওয়ার পরে বসিয়ে দেন। উনুনে সেই অসম্ভব খাদ্যদ্রব্যটি অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ হয়।

তারপর টগবগে ফুটন্ত মাংসের ঝোল মনোরমা চিলির বাটির মধ্যে ঢেলে দেন। প্রথমদিকে একবার উত্তেজনায় গরম মাংসের ঝোলে মুখ দিয়ে জিভ পুড়ে গিয়েছিল, তাই পরে সাবধান হয়ে গেল। গরম মাংসের ঝোল বাটিতে দেবার পরে তার চারদিকে ঘেউ-ঘেউ করে গর্জন করে পাক খায়, সত্যি মনে হয় যেন কোনো শিকার ধরছে। তারপর এক সময় আস্তে সামনের ডান পা দিয়ে বাটিটা কাত করলে একটু ঝোল বা মাংসের টুকরো মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। তখন সেটায় মুখ দিয়ে দেখে এখনো কতটা গরম, এর পর ধীরে ধীরে গরম সইয়ে সইয়ে সেটা খেয়ে নেয়।

যে-কোনো কুকুরছানা মানুষের শিশুর মতোই। যখন তার দাঁত উঠতে থাকে তখন খুব কামড়ানোর বাতিক হয়। মালতী নিজেই তার ছোটবেলায়, একেবারে ছোট যখন সে, সদ্য দুধ-দাঁত ওঠা শুরু করেছে, সে সময় যে-কেউ তার ঠোঁটে বা গালে আঙুল দিয়ে আদর করতে গেলে তার আঙুলটা কায়দা করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে সহসা কামড়ে দিত।

চিলি অবশ্য এমনি অন্য কাউকে কামড়ায়নি। কিন্তু সে তার দাঁতের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করত নানা জিনিসের উপরে। পাপোশের উপর শুয়ে শুয়ে দরজায় ঝোলানো মোটা পদটা ধরে এক সকাল বেলা চিবিয়ে সেটার নীচের দিকে দশ বারো আঙুল জায়গা ছিঁড়ে ফেলেছে। এর পরে চেবাল পরিতোষবাবুর চশমার খাপ। চামড়ার খাপটা রাতের বেলা পরিতোষবাবু মাথার কাছে বিছানায় রেখে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেটা এক সময় খাট থেকে নীচে পড়ে যায়। রাতেই হোক আর খুব সকালেই হোক সেটা চিলি মুখে তুলে নিভৃতে খাটের নীচে নিয়ে চিবিয়েছে। পরিতোষবাবু সকালবেলা উঠে চশমার খাপটা খুঁজে পেলেন না, ভাবলেন, এদিক-সেদিক কোথাও আছে।

নাড়ুর মা ঝাঁট দিতে গিয়ে খাটের নীচে থেকে সেটাকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় বার করল, "আরে সর্বনাশ! কুকুরটা তো আলুকপি থেকে চশমা, পর্দা সব খাচ্ছে। আরে সর্বনাশ ! এটা তো একটা রাক্ষস।"

চশমার দাঁতেকাটা চিবোনা খাপটা দেখিয়ে মনোরমা চিলিকে বললেন, "এটা কে করেছে?" চিলি ধমক খুব ভাল বোঝে, মাথা নিচু করে চিলি অপরাধ স্বীকার করল, মনোরমা তাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বারান্দার দিকে দেখিয়ে বললেন, "ঐখানে গিয়ে বসে থাকো সারাদিন, ঘরে ঢুকবে না। আজ তোমার সকালের খাবারও বন্ধ।" চিলি বিনা বাক্যব্যয়ে লেজ গুটিয়ে বারান্দায় গিয়ে নির্বাসিত হল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত দুপুরে তাকে তার বরাদ্দ দুধভাত দেওয়া হয়েছিল। যখন মনোরমা দেখলেন চোখ ছলছল করে মাথা এলিয়ে দিয়ে বারান্দায় শুয়ে আছে, খিদেয় পেটটা পিঠের সঙ্গে লেগে আছে চিলির, তিনি তাকে দুধভাতটা দিলেন। কিন্তু তখন চিলির কী অভিমান, হৌ-ঔ করে মনোরমার পায়ের কাছে লুটিয়ে-লুটিয়ে কত রকম করল। মনোরমা অবশেষে বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর কখনো দুষ্টুমি কোরো না, এখন খেয়ে নাও।"

চিলির বিপদ

সব ছোট ছেলে-মেয়েই যা করে মালতীর ক্ষেত্রেও তাই হল, সেই যে তাকে তার মা চিলির জীবনী লিখতে লাল ডায়েরিটা দিয়েছিল, প্রথম দিকে খুব উৎসাহে তাতে অনেক কথা লিখত। কিন্তু সে খাতা প্রায় ফাঁকাই রয়ে গেল।

এই ফাঁকার মধ্যে এক জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে মালতী লিখে রেখেছে ১৯ মার্চ, রবিবার। আজ চিলি মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়েছিল। প্রাণ হারায়নি এটাই আশ্চর্য।

একটু বড় হতেই চিলি রাস্তায় বেরোতে লাগল। বিকেলে মালতীর সঙ্গে বাড়ির কাছে ত্রিকোণ পার্কে যায়, সেখানে মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে। ত্রিকোণ পার্কে বিকেল বেলায় আরো দু-চারটে কুকুর আসে, তারা সবাই বেশ শান্ত, ভদ্র। বড় কুকুরগুলো তো চিলির মতো বাচ্চা কুকুরকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। শুধু একটা বুড়ো, কালো অ্যালসেশিয়ান আছে, বয়েস হয়ে গেছে, একা একা বসে ঝিমোয় সে, চিলি কাছে গেলে গরর-গরর করে। কিন্তু চিলিও যেন কেমন, ঐ কুকুরটার কাছেই তার যাওয়া চাই। কুকুরটার কাছে গিয়ে লেজ নেড়ে, চিত হয়ে শুয়ে, চার পা উপরে তুলে, কুঁকুঁ শব্দ করে নানাভাবে এই বৃদ্ধ কুকুরটিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে তার চলে না। মালতী প্রথম-প্রথম ভয় পেত বুড়ো কুকুরটা চিলিকে কিছু না বলে, কিন্তু দেখা গেল ঐ গরর-গরর পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি কিছু কুকুরটা করে না। আসলে এইটুকু ছোট কুকুর তাকে বিরক্ত করবে এটা তার পছন্দ নয়।

সে যা হোক, ধীরে ধীরে চিলির বাইরে যাওয়ার ঝোঁক বড় বেড়ে গেল। এক বুদ্ধি বার করেছে। মালতীর পড়ার টেবিলে উঠে বাইরের জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। একতলা নিচু বাড়ি, কোনো অসুবিধেই হয় না। সদর দরজা বন্ধ থাকলেও চিলি অনায়াসে রাস্তায় চলে যায়। আর আজকাল রাস্তায় সে শুধু ঘাস-পাতা চিবোতে বা বাথরুম করতে যায় না। বড় বস্তা কাঁধে ছেড়া

কাগজকুড়ানো ভবঘুরে যাচ্ছে, পুরনো কাগজ-শিশি-বোতলওলা চেঁচাচ্ছে, এদের একটু ঘেউঘেউ করে তেড়ে যাওয়া ; ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদরওলা বা বাঁশি বাজিয়ে সাপুড়ে এসেছে, তাদের একটু ধমকানো—এ সব চিলি তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ধরে নিয়েছে। এই সব করতে বারবার সে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঠিক কাউকে কামড়ায় না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে তীব্র গর্জনে প্রতিবাদ জানায়।

এই করতে গিয়েই উনিশে মার্চ বিকেলে বিপদটা ঘটল। সেদিন রবিবার, পরিতোষবাবু, মনোরম দেবী ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন। মালতী পাশের বাড়িতে গেছে। তার এক বন্ধুর কাছে, একটু পরে ফিরে এসে চিলিকে নিয়ে পার্কে যাবে। এমন সময় চিলির একটা করুণ আর্তনাদ, একটা দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সি বাড়ির সামনের রাস্তায় চিলিকে এমন জোরে ধাক্কা দিয়েছে যে, চিলি দশহাত ছিটকিয়ে গেছে। ভাগ্যের কথা যে উপর দিয়ে চলে যায়নি, তা হলে একদম পিষে যেত।

পরিতোষবাবু ছুটে গিয়ে যখন চিলিকে কোলে তুলে নিলেন, তখনো চিলি কেঁউ-কেঁউ করে কাঁদছে, আর থর-থর করে বলছে, কানের কাছটা দিয়ে একটু রক্ত বেরোচ্ছে।

মালতীও ছুটে এসেছে। কান্নাকান্না মুখ তার, "বাবা, কিছু হয়নি তো?"

চিলিকে বাসায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। মনোরমা একটু গরম দুধ দিলেন ওকে। চিলি অনেকক্ষণ জিভ বার করে হাঁপাল তারপর দুধটা খেয়ে একটু চাঙা হয়ে উঠল। কানের কাছটা যে জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল সেখানে ডেটল লাগাতে আবার কিছুক্ষণ কেঁউ-কেঁউ করল।

তবু এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল। আবার -একা রাস্তায় বেরোলে চাপা পড়বে এই ভয়ে, ঠিক করা হল এখন থেকে চিলিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে, যাতে যখন তখন বেরিয়ে না যায়।

যে শিকলটা চিলিকে নিয়ে আসবার পরে কেনা হয়েছিল, সেটাকে তুলনায় তখন যেন ভারী আর বেমানান মনে হয়েছিল এখন চিলি বেশ বেড়ে যাওয়ায় সেটা আর ততো ভারী বা বড় মনে হয় না ।

চিলির এখন প্রায় চার মাস বয়েস, বেশ তেজি কুকুর হয়ে উঠেছে সে। মালতী তাকে পার্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে একটা বঞ্চ বসে একটা নতুন অরণ্যদেব পড়ছে। হঠাৎ হৈ-চৈ শুনে তাকিয়ে দেখে চিলি একটা অচেনা কুকুরের সঙ্গে প্রাণপন লড়ছে। এ কুকুরটাকে আগে কখনো এই পার্কে দেখেনি মালতী, হয়তো কোনো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। অথবা, যা চেহারা, রাস্তার কুকুরও হতে পারে।

এই নতুন কুকুরটা কিশোরী চিলির চেয়ে দ্বিগুণ আয়তনের। কিন্তু দেখা গেল চিলি ছাড়বার পাত্র নয়। সে অনেক বেশি ক্ষিপ্র এবং হিংস্র। যদি বড় কুকুরটা চিলিকে চেপে ধরতে পারে তবে চিলির রক্ষা নেই তবে চিলি বারবার বড় কুকুরটার সামান্য অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে আবার নিরাপদ দূরতে গিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে চর দিচ্ছে।

মাঠের এক প্রান্তে বসে ঝিমোচ্ছিল সেই চিলির গুরুদেব বুড়ো আলসেশিয়ানটা। হঠাৎ চিলির এই লড়াই দেখে সে বার্ধক্যের ঝিমুনি ফেলে তিন লাফে সমরাঙ্গণে প্রবেশ করল এবং তারপরে চিলির আক্রমণকারীকে মুহুর্তের মধ্যে দুটি কামড়ে ধরে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরল, এইভাবে মিনিট-খানেক ধরে রেখে কুকুরটাকে ছেড়ে দিতেই কুকুরটা ত্রিকোণ পার্ক থেকে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

চিলিকে বাড়িতে নিয়ে এসে দেখা গেল তার শরীরের নানা জায়গায় অনেক ছেঁড়া কাটা রক্তারক্তি । পরিতোষবাবু বললেন, কালকেই পশু হাসপাতালে নিয়ে দেখাতে হবে, অচেনা কুকুরের আক্রমণে। জলাতঙ্ক না হয়।

কুকুরের হাসপাতাল এখান থেকে খুব দূরে নয়। তাঁরা দেখে বললেন, মনে হয় না মারাত্মক কিছু। এখন লোশন দিয়ে দিচ্ছি। আর ছমাস বয়েস হলে নিয়ে আসবেন। অ্যান্টিব্যাডি বা জলাতঙ্ক নিরোধক ইঞ্জেকশন দিয়ে দেব।

ঠিক গুনে গুনে চিলির দু-মাস হলে মালতী বাবার সঙ্গে চিলিকে নিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে আনল। যারা ইঞ্জেকশন দিল তারা এসব কাজে খুবই দক্ষ,

একজন শিকল ধরে একটা জানলার ওপাশ থেকে চিলিকে টেনে রাখল আর সেই মুহূর্তে অন্যজন পিছন থেকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল।

দিন যেতে লাগল। ভাদ্র মাসে পরপর তিনদিন ভীষণ বৃষ্টি হয়ে কলকাতার রাস্তাঘাট খুব জলে ডুবে গেল । অঘ্রান মাসে মালতীদের পরীক্ষা হল। মালতী এবার ভূগোলে তেমন খারাপ করেনি। চিলি বড় হচ্ছে, দেখতেও সুন্দর হচ্ছে। আবার শীত এলো, আবার গরমের দিন লেক, ত্রিকোণ। পার্ক, রাস্তা, বাড়ি কখনো দুধভাত, কখনো মাংসের ছাঁট, কাঁচা আলু খেয়ে ঘুমিয়ে, খেলা করে, বেড়িয়ে চিলি চমৎকার বেড়ে বেড়ে উঠল। কিছু কিছু অদৃশ্য শত্রু, পাশের বাড়ির একটা হলো বেড়াল, রাস্তায় চিলির চক্ষুশূল দু-একজন ভিখিরি বা ফেরিওলা এদের উদ্দেশে জানলা থেকে তর্জন-গর্জন করে, আর বাকি সময় মালতী, পরিতোষবাবু বা মনোরমা দেবীর সঙ্গে আহ্লাদ করে চিলির বয়েস দুই বছর পূর্ণ হয়ে আবার আরেকটা শীতকাল এসে গেল। এখন চিলির বয়েস মানুষের হিসেবে চব্বিশ বছর।

আজকাল চিলি বারান্দায় শোয়। অতন্দ্র সারারাত, একটা পাতার শব্দ হলে পর্যন্ত ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে। এরই মধ্যে গ্রীষ্মের শুরুতে একদিন হঠাৎ সকালবেলা থেকে চিলি বাসায় নেই। পরিতোষবাবু আর মালতী ত্রিকোণ পার্ক থেকে লেক, আশেপাশের গলিটলি সব খুঁজে এল। কোথাও নেই, শুধু নাড়ুর মা বলল যে সে কাজে আসার সময় দেখেছে বড় রাস্তার মোড়ে এক দঙ্গল কুকুর জটলা করছে। এখন তার মনে হচ্ছে যেন তার মধ্যে চিলিও আছে।

আবার ছুট-ছুট, কিন্তু নাড়ুর মা নির্দেশিত স্থানে বা আশেপাশে চিলিকে পাওয়া গেল না।

চিলির প্রত্যাবর্তন

চিলি এল না। বেলা সাড়ে নটা-দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে দেরি করে পরিতোষবাবু অফিস গেলেন। মালতীও ইস্কুল গেল মুখ কালো করে। চিলির অনুপস্থিতিতে সমস্ত বাড়িটা কেমন ফাঁকা আর শূন্য। মনোরমা দেবী দুপুরবেলা ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছেন এমন সময় সামনের দরজায় ঠিক মানুষের মতো কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললেন, দেখলেন চিলি ফিরে এসেছে।

একবেলায় এ কী চেহারা হয়েছে চিলির, সারা গায়ে রাস্তার ধুলোবালি মাখা, মারামারির চিহ্ন শরীরে, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত চিলি কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছে। মনোরমা তাকে খুব ভাল করে খেতে দিলেন। তারপরে বিকেলে মালতী পরিতোষবাবু ফিরে এলে অনেকদিন চিলিকে আবার ডগসোপ আর গরমজল দিয়ে খুব ভাল করে স্নান করানো হল।

চিলি যাতে আর না পালায় আবার তাকে কিছুদিন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল। তবে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সে আজকাল খুব শান্ত হয়ে গেছে। যতক্ষণ পারে শুয়ে শুয়ে ঘুমায়। তারপর একদিন দেখা গেল রান্নাঘর আর বাধরুমের মধ্যে ছোট ফাঁকাটায় চিলি টুকরো ছেঁড়া কাগজ এই সব নিয়ে জড়ো করছে। পরিতোষবাবু মনোরমাকে বললেন “ওখানেই এখন থেকে চিলি শোবে। আমার মনে হচ্ছে ওর বাচ্চা হবে বাচ্চাদের জন্যে বিছানা বানাচ্ছে। মনোরমা একটা পুরনো ছেঁড়া কম্বল করে সেখানটায় দিয়ে দিলেন। চিলি উলটে-পালটে, নিজের মনোমত কুণ্ডলী পাকিয়ে তার উপরে কয়েকপাক ঘরে একদিন রাত সাড়ে তিনটে ।হঠাৎ চিলি দরজা আঁচড়াচ্ছে। পরিতোষবাবু তাড়াতাড়ি ঘুম-চোখে দরজা খুলে দেখেন সামনে চিলি দাঁড়িয়ে, তার মুখে একটা বড় ইঁদুরের মতো বাদামি রঙের চোখ বোজা কুকুরছানা, বোধহয় এখনই জন্মেছে, জন্মানো মাত্র চিলি তার প্রভুকে তার প্রথম সন্তান দেখাতে এসেছে। পরিতোষবাবু চিলির মাথায়

হাত বুলিয়ে বললেন, “কী সুন্দর বাচ্চা হয়েছে তোমার । যাও বিছানায় নিয়ে যাও।”

রাতে আর চিলি বিরক্ত করল না। পরিতোষবাবুও মালতী বা মনোরমাকে কিছু বললেন না। তারা অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে।

পরিতোষবাবুর আর ঘুম এল না । পাঁচটা নাগাদ একটু ফর্সা হতেই মালতী আর তার মাকে ডেকে সুখবরটা শোনালেন। মালতী তো রীতিমত উত্তেজিত, “বাবা, ক’টা ছানা হয়েছে?” পরিতোষবাবু বললেন, “চলো, দেখা যাক।” সবাইকে আসতে দেখে চিলি উঠে এল, এসে লেজ নাড়তে লাগল। মনোরমা তাকে তখনই যেটুকু দুধ বাড়িতে ছিল দিলেন।

দেখা গেল, বেশি নয় চিলির মাত্র দুটো ছানা হয়েছে। একটা সাদা ধবধবে, মায়ের সঙ্গে চেহারার কোনো মিল নেই। সেটা মেয়ে কুকুর, তার নাম দেওয়া হল মোমবাতি। দ্বিতীয়টি, যেটা প্রথম চিলি পরিতোষবাবুকে এনে দেখিয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ মায়ের মতো গায়ের রঙ, ছেলে কুকুর। খুব মোটাসোটা গোলগাল, হাতির ছানার মতো, তার নাম দেওয়া হল গজানন।

গজানন, মোমবাতি বড় হতে লাগল। তাদের উপর মায়াও বাড়তে লাগল বাড়ির সকলের। কিন্তু তিনটে কুকুর তো এটুকু বাড়িতে রাখা যাবে না, আর খরচের ব্যাপারটাও তো আছে।

মোমবাতি আর গজাননকে বিলিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয়, অনেকেই ওদের চাইছে। চার সপ্তাহ বয়েস হতে, তখনো মায়ের দুধ ছাড়েনি, মোমবাতিকে এসে মালতীর মামাতো ভাই গোপাল নিয়ে, গেল। চিলি একটু কুঁকুঁ করে কাঁদল। শেষের দিকে চিলি অবশ্য বাচ্চা দুটোকে ভাল করে দুধ দিচ্ছিল না। কাছে গেলেই বিরক্ত হত, খ্যাক করে তাড়িয়ে দিত। তবু মোমবাতি চলে যাওয়ার পরে একটু মনমরা হয়ে রইল।

আরো সপ্তাহ-দুয়েক পরে অনেক ভেবেচিন্তে যাতে চিলি প্রতিদিন তার ছেলেকে দেখতে পায় সেই জন্যে, সামনের বাড়ির ডাক্তারবাবু চেয়েছিলেন, তাঁকেই গজাননকে দেওয়া হল।

এরপর শুরু হল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। গজানন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়ে লণ্ডভণ্ড শুরু করে দিল। বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়তে লাগল, সব ছিঁড়েফিড়ে, উলটে-পালটে ভেঙে ফেলতে লাগল। আর অহরহ পরিত্রাহি চিৎকার, সে কী করুণ আর্তনাদ! সে এ বাড়িতে তার মার কাছে ফিরে আসবে। তার মাও যখনই তার গলা শুনতে পাচ্ছে প্রত্যুত্তরে চিৎকার করে ছেলেকে ডাকতে লাগল। মালতীরা কানে আঙুল দিয়ে রইল, কিন্তু রাস্তায় বেরোলেই ও বাড়ির জানলা দিয়ে গজানন দেখতে পায় আর আরো চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে।

দুদিনের মাথায় ডাক্তারবাবু অতিষ্ঠ হয়ে গজাননকে ফেরত দিয়ে গেলেন। এবার ঠিক হল, গজাননকে চোখের আড়ালে বেশ দূরে দেওয়া হবে। যেখানে থেকে সে মায়ের কিংবা মালতীদের শব্দ, গন্ধ কিছুই পাবে না। প্রায় আধ মাইল দূরে একটা বড় রাস্তা কয়েকটা গলি পার হয়ে মালতীর এক বান্ধবী চম্পাদের বাড়িতে গজাননকে দেওয়া হল। চম্পারা কুকুর খুব ভালবাসে, ওদের কুকুরটা কয়েক মাস আগেই মারা গেছে।